The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 2 October, 2025 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনাত্মক আলোচনা

Sulekha Ghosh
M.A. in Bengali, Rabindra Bharati University, West Bengal, India
DOI: https://doi.org/10.70798/TGJCT/01020016

Abstract

*আমাদের জন্মের কারণই হল দুঃখ। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র, উপনিষদ্ এমনকি শ্রীমদ্ভগবত গীতাতেও **'দুঃখ'** শব্দটি নিয়ে বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। ঠিক তেমনই আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের জীবনও দুঃখময়। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর ছোটগল্পগুলির পরতে পরতে আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়গণের মানুষগুলির জীবনসংগ্রাম, শোষণ, বঞ্চনা এবং তাদের বেঁচে থাকার অধিকারের লড়াই-এর চিত্র বিশেষভাবে উপস্থাপন করেছেন। ছোটগল্পের মূল লক্ষ্য হল অল্পকথায় জীবনের একটি বিশেষ বা খণ্ডিত অংশকে আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরা। জনচিত্তের আকাঙ্ক্ষা অনুসারেই সাহিত্যে বিশেষ বিশেষ রচনার জোয়ারভাঁটা। মহাশ্বেতা দেবী বাংলা কথাসাহিত্যে একজন ব্যতিক্রমী লেখিকা। তিনি নিজের লেখনীর মাধ্যমে আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের কথা তুলে ধরেছেন। মহাশ্বেতা দেবী বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরে আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের চোখ দিয়ে জীবনকে দেখেছেন। আর সেগুলি সমাজের কাছে তুলে ধরার অন্যতম মাধ্যম ছিল তাঁর সাহিত্যকলম। তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলি পাঠ করলেই তার প্রমাণ মেলে। তাঁর **'বাঁয়েন'**, **'বেহুলা'**, **'সাঁঝ সকালের মা'**, **'দ্রৌপদী'**, **'শিকার'** প্রভৃতি ছোটগল্পগুলিই হল তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। উল্লেখ্য গল্পগুলির মাধ্যমে তিনি আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের জীবনের কষ্ট, দুঃখ এবং চরম দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। যা তাদের অস্তিত্বের লড়াই এবং সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে উঠেছে। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সমাজের সম্ভাব্য কাহিনীকে এক পুরাবৃত্তীয় কল্পমাত্রা দেন, যা বাস্তবের মধ্য দিয়ে উদ্ভব হয়ে বাস্তবকে অতিক্রম করে। এই ভাবে তাঁর লেখা হয়ে উঠেছে আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক দলিলস্বরূপ।*

Keywords: *ত্বরান্বিত, ঘটনাস্রোত, প্রান্তিক, নিকৃষ্ট, সংস্কারবিনাসী, অন্তরঙ্গতা, বাস্তববিসারী*

ভূমিকা

"ছোট প্রাণ, ছোট ব্যাথা, ছোট ছোট
দুঃখ কথা নিতান্তই সহজ সরল;
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে
ভাসি তারি দুচারিটি অশ্রুজল।"

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
সোনার তরী- পৃঃ-৩৫

আমাদের জন্মের কারণই হল দুঃখ। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে প্রায় সকল সম্প্রদায়ই দুঃখ এবং দুঃখ নিবৃত্তির বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তারমধ্যে অন্যতম হল বৌদ্ধদর্শন। যদিও চার্বাকগণ এই ধারণার পরিপন্থী। বৌদ্ধদর্শনে বুদ্ধদেব বলেছেন—**"সর্বম দুঃখম"**। অর্থাৎ সবকিছুই দুঃখময়। এছাড়াও উপনিষদ এমনকি শ্রীমদ্ভগবত গীতাতেও **'দুঃখ'** শব্দটি নিয়ে বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। দুঃখ সকল ব্যক্তির জীবনেই বর্তমান। ঠিক তেমনই আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের জীবনও দুঃখময়। সেই দুঃখময় জীবনের বর্ণনাই মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প গুলিতে দর্পণের প্রতিবিম্ব স্বরূপ ফুটে উঠেছে। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর ছোটগল্পগুলির পরতে পরতে আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষগুলির জীবনসংগ্রাম, শোষণ, বঞ্চনা এবং তাদের বেঁচে থাকার অধিকারের লড়াই এর চিত্র বিশেষভাবে উপস্থাপন করেছেন।

All rights reserved. © 2025

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 2 October, 2025 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

মহাশ্বেতা দেবীর লেখার প্রেরণা হল সেই মানুষগুলি যাদের পদদলিত ও ব্যবহার করা হয়। অথচ যারা হার মানে না। তাঁর লেখার উৎসটি হল এই মহৎ আশ্চর্য ব্যক্তিরা, এই অত্যাচারিত মানুষগুলি।

ছোটগল্পের উদ্ভব

বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাব হল আধুনিক কালের এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ছোটগল্প পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে সন্ধান করা হলে অতি প্রাচীনকাল থেকেই পাওয়া যাবে কিন্তু **'ছোটগল্প'** নামক এই বিশেষ রূপটি সচেতনভাবে সৃষ্টি হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশের সাথে জড়িত। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ছোটগল্পকে সঙ্গায়িত করা হয়েছে। ছোটগল্প যে ছোট আকৃতির হয় তা নামেই বোঝা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—ছোটগল্প প্রথমে **'গল্প'** তারপর **'ছোট'** হওয়া উচিত। ছোটগল্পের মূল লক্ষ্য হল অল্পকথায় জীবনের একটি বিশেষ বা খণ্ডিত অংশকে আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা। ছোটগল্প দুই (২) পৃষ্ঠার ও যেমন আছে আবার কুড়ি (২০) পৃষ্ঠার ও আছে। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত কারণে ছোটগল্পের রূপ ত্বরান্বিত হয়েছে তার একটি অন্যতম কারণ হল অসংখ্য পত্রিকার উদ্ভব। পত্রিকাগুলিই ছোটগল্প রচনার উৎসাহদাতা। জনচিত্তের আকাঙ্খা নিবারণের বাসনা সর্বদাই লেখকলেখিকাদের মধ্যে থাকে। জনচিত্তের সেই আকাঙ্খা অনুসারেই সাহিত্যে বিশেষ বিশেষ রচনার জোয়ার ভাঁটা। অতএব বলাই যায় পত্রিকার বুকে ছোটগল্পের জন্ম ও প্রতিষ্ঠা।

মহাশ্বেতা দেবীর পরিচয়

মহাশ্বেতা দেবী বাংলা কথাসাহিত্যে একজন ব্যতিক্রমী লেখিকা। তিনি নিজের লেখনীর মাধ্যমে আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের কথা তুলে ধরেছেন। কখনও বা চুয়াড় বিদ্রোহ, কখনও বা মুণ্ডা বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ আবার কখনও বিশ শতকের সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি নিয়ে অসংখ্য ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের অধিকারের জন্য তাঁর কলম হয়ে উঠেছিল হাতিয়ার। ১৯২৬ সালের ১৪ই জানুয়ারী বাংলাদেশের ঢাকা শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এক অভিজাত এবং উচ্চশিক্ষিত পরিবারে। বাবা মনীশ ঘটক ছিলেন নামকরা একজন সাহিত্যিক। মাতা ধরিত্রী দেবী ছিলেন একজন লেখিকা ও সমাজসেবী। এমনকি মহাশ্বেতা দেবীর কাকা ঋত্বিক ঘটক ছিলেন একজন নামকরা চলচ্চিত্র পরিচালক। মহাশ্বেতা দেবী দেশভাগের পর ১৯৩৬ সালে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন পড়াশোনা করার জন্য। তিনি ১০০টিরও বেশি উপন্যাস ও ২০টির বেশি ছোটগল্প রচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি কিছু নাটক এবং প্রবন্ধও রচনা করেছেন। ১৯৬৪ সালে তিনি বিজয়গড় কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৭৯ সালে মহাশ্বেতা দেবী সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার এবং ১৯৯৬ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন। পাশাপাশি তিনি পদ্মবিভূষণ ও বিশ্বভারতী দেশিকোত্তম সম্মান লাভ করেন। ২০১৬ সালের ২৩শে জুলাই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার বেলভিউ ক্লিনিকে ভর্তি হন। সেই বছরই ২৮শে জুলাই তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমেই একজন উচ্চমার্গের সাহিত্যিক তথা সমাজ দরদি মানুষকে আমরা হারিয়ে ফেলি চিরতরে।

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনাত্মক আলোচনা

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের কথা, তাদের জীবনসংগ্রামের কথা স্বচ্ছভাবে দৃশ্যমান। তিনি আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের চোখ দিয়ে জীবনকে দেখেছেন। আর সেগুলি ব্যাখ্যা করার মাধ্যম ছিল সাহিত্য সৃজন। এই দলিত সম্প্রদায়গণ তাঁর কাহিনি বৃত্তের মানক হিসাবে কাজ করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বাগদি, ডোম, পাখমারা, ওঁরাও, লোধা-শবর প্রভৃতি জনজাতির মানুষদের কথা। তিনি আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের জীবনকে সামনে রেখে প্রচুর ছোটগল্প রচনা করেছেন। যেমন— **'জতুধান'**, **'বান'**, **'বাঁয়েন'**, **'সাঁঝ সকালের মা'**, **'শিকার'**, **'বিছন'**, **'বেহুলা'**, **'দ্রৌপদী'**, **'মৌল-অধিকার ও ভিখারী দুসাদ'** প্রভৃতি। এই গল্পগুলিতে যে অন্তেবাসী সমাজ বা সম্প্রদায়গুলিকে দেখা যায় তাদের মধ্যে রয়েছে— **সাঁওতাল ('জতুধান'), বাগদি ('বান'), ডোম ('বায়েঁন'), পাখমারা ('সাঁঝ-সকালের মা'), ওঁরাও ('শিকার'), মাল বা ওঝা ('বেহুলা'), সাঁওতাল ('দ্রৌপদী'), দুসাদ ('মৌল-অধিকার ও ভিখারী দুসাদ')**।

মহাশ্বেতা দেবী বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে সেখানকার নিঃস্বজনের বেদনার প্রকৃত চিত্র অনুভব করেছেন। সেগুলি সমাজের কাছে, সরকার পক্ষের কাছে তাঁর তুলে ধরার অন্যতম মাধ্যম ছিল তাঁর সাহিত্যকলম। বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতাজনিত ঘটনাস্রোতকে সম্মুখে রেখে তিনি বৈচিত্র্যময় ছোটগল্প সৃষ্টি করেন। যার ফলে আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়গণের জীবনসংগ্রামই হয়ে ওঠে তাঁর ছোটগল্পের

All rights reserved. © 2025

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 2 October, 2025 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

প্রেক্ষাপট। মহাশ্বেতা দেবীর রচিত ছোটগল্পগুলিতে আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশার ইতিহাস কিভাবে উন্মোচিত হয়েছে তা তাঁর ছোটগল্পগুলি পাঠ করলেই উপলব্ধি করা যায়।

বাঁয়েন সমাজের অন্ত্যজ ভুলে যাওয়া একটি চরিত্র। যাকে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর **'বাঁয়েন'** নামক গল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী যাকে তুলে ধরেছিলেন তাঁর নিজস্ব গল্প বলার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে। মহাশ্বেতা দেবীর **'বাঁয়েন'** নামক গল্পে দেখা যায়, মলিন্দর গঙ্গাপুত্র শ্মশানের ডোম থেকে মহাকুমার লাশঘরে কাজ পেয়েছে। কিন্তু তার বিশ্বাসের সংস্কার বদলায়নি। নিজের স্ত্রীকে বাঁয়েন বলে চিহ্নিত করে সমাজের থেকে বের করে দিতেও তাঁর বাধে না। **'বাঁয়েন'** গল্পের সবচেয়ে যন্ত্রনার জায়গা এখানেই। আলোচ্য গল্পে মলিন্দরকে ঢোলে কাঠি দিয়ে গ্রাম কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে বলতে শোনা গেছে—

"আমি মলিন্দর গঙ্গাপুত্ত শোহরৎ দেই।
আমার বউ বাঁয়েন হয়্যাছে গো বাঁয়েন
হয়্যাছে!"

যারা নিজেরা ভদ্র সমাজ থেকে নির্বাসিত তারাই আবার নিজেদের একজনকে নিজেদের সমাজ থেকে বের করে দেয়। মনুষ্য সমাজের প্রান্তদেশে যারা বাস করে, তারা যখন কাউকে বের করে দেয়, সেই নির্বাসিতা বাধ্য হয় সেই জায়গাটা মেনে নিতে। শুধু তাই নয় মলিন্দর ছেলে ভগীরথকে বলে—

"আগে মানুষ ছিল, তোর মা ছিল।"

যদিও পরবর্তীকালে চণ্ডী (বাঁয়েন) তার নতুন প্রতিরোধী ভূমিকার দ্বারা ভয় ধরায় সামাজিক ডাকাতদের মনে। নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে গ্রামের মানুষজনদের বাঁচায়। চণ্ডীর প্রবল নৈতিক আত্মঘোষনাই তাকে ফিরিয়ে আনে সমাজে। তার মৃত্যুর পর সে প্রমাণ করে গেল **"সে-ও রক্ত-মাংসের মানবিক গুণসম্পন্ন স্নেহময়ী জননী, বাঁয়েন নয়।"**
এইভাবে মহাশ্বেতা দেবী **'বাঁয়েন'** ছোটগল্পে ডোম সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশা, শোষণ এবং সামাজিক অবহেলার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি ডোম সম্প্রদায়ের বঞ্চনা ও শোষিত জীবনকে বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রিত করেছেন আলোচ্য ছোটগল্পে।

অন্যদিকে সংস্কারের প্রবলভার সরিয়ে আধুনিক মানসিকতার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের আরেক চিত্র আমরা **'বেহুলা'** গল্পে দেখতে পাই। এই গল্পে মহাশ্বেতা দেবী দক্ষিণবঙ্গের বাদা অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষগুলির জীবনসংগ্রাম ও দুঃখ-কষ্টকে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা সাম্রাজ্যবাদী শোষণমূলক শক্তির বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের প্রতীক। গল্পে বেহুলা নামক একটি গ্রামের বর্ণনা আছে। যেখানে একটি নদী ও গ্রামের নাম বেহুলা। গ্রামীণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কার কীভাবে তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে, তা গল্পে উল্লেখযোগ্য একটি দিক। আলোচ্য গল্পের প্রধান চরিত্রসমূহ হলো দরিদ্র আদিবাসী এবং দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ। এখানে বেহুলা শুধু একটি নাম নয়, এটি সেই শোষিত সমাজের প্রতিচ্ছবি। শহরের শিক্ষিত এক যুবক, বসন্তকুমার গবেষণার কাজে গ্রামে আসে সাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। সেখানে এসে দেখতে পায় স্থানীয় অসহায় দরিদ্র মানুষগুলি কীভাবে উচ্চবিত্ত ও ক্ষমতাবান মানুষগুলির দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে। গল্পে দেখানো হয়েছে, এক সাপুড়ে ও কিছু প্রভাবশালী মানুষের নিকৃষ্ট চক্রান্তে কীভাবে সাপের কামড়ে লোকজন মারা যায়। এ কোন দৈব অভিশাপ নয়। এই চক্রান্তের পেছনে ছিল অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং ক্ষমতা দখলের লোভ। তবে আলোচ্য গল্পটি রচনার মাধ্যমে মহাশ্বেতা দেবী আমাদের এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই একমাত্র পথ। এইভাবেই মহাশ্বেতা দেবী তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক, আদিবাসী এবং দলিত সম্প্রদায়ের বাস্তবতাকে তুলে ধরেন। **'বেহুলা'** গল্পটি এর ব্যতিক্রম নয়। বেহুলা গল্পটি শেষ হয় একটি ভয়মুক্ত সংস্কারবিনাসী সর্পযজ্ঞের মাধ্যমে—

"গ্রামের লোকগুলির শোক, কালাজ-বিষয়ে ভয়,
হেদো নস্করের ওপর রাগ, সব উত্তরিত হয় এক্ষণিক
প্রজ্বলন্ত ক্রোধে। আগুন তাই ভীষণ জ্বলে।"

মহাশ্বেতা দেবীর একটি বিখ্যাত ছোটগল্প **'সাঁঝ সকালের মা'**। তিনি দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসী সম্প্রদায়কে নিয়ে কাজ করার সুবাদে যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, সেসব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে মহাশ্বেতা দেবী মেদিনীপুর অঞ্চলের পাখমারা সম্প্রদায়ের চরিত্র অবলম্বনে এই অভিনব ছোটগল্পটি রচনা করেছেন। গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র জটি এবং সাধন কান্দরী। এই দুটি চরিত্রকে পরিস্ফুটন করার জন্য

All rights reserved. © 2025

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 2 October, 2025 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

আনুষঙ্গিকভাবে যেসব ঘটনা ও চিত্রের সমাবেশ ঘটেছে, তার মধ্য দিয়েই একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের পরিচয় আলোচ্য গল্পের মধ্যে ফুটে উঠেছে। **'সাঁঝ সকালের মা'** গল্পটি এক মৃত্যুকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। আর এই মৃত্যুর কাছাকাছি এসে, এই মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জটেশ্বরী ঠাকুরানি সত্তা থেকে সরে গিয়ে তার স্বাভাবিক মানবী সত্তায় ফিরে আসে। ডোমদের অভিশপ্ত অন্ত্যজ জীবনের পিছনে যেমন হরিশ্চন্দ্রের উপহার, পাখমারারাও তেমনি জরা ব্যাধের বংশধর রূপে **'ঈশ্বরকে হত্যা করেছিল বলে'** অভিশপ্ত। বন্য আত্মনিবেদনের রোম্যান্সে মলিন্দর-চণ্ডী, জটি-উৎসবের প্রেমের সূত্রপাত। মলিন্দরের মতো জটি-উৎসবও প্রথাগত বৃত্তি থেকে সরে এসেছিল। তারপর উৎসবের মৃত্যুর পর অনেক চেষ্টা করেও জটি পাখমারাদের সমাজে আর ফিরে যেতে পারেনা। অলৌকিকতার বর্ম দিয়ে জটি নিজেকে বাঁচিয়েছিল। সন্ধ্যে হলে ঠাকুরানি হয়ে যেত সাধনের মা। ঠাকুরানি হয়ে যে চাল পেত, মা হয়ে তার ভাত রেঁধে ছেলে সাধনকে খাওয়াতেন। ছেলেকে বাঁচানোর জন্য জটি যে দেবীত্বকে উপায়স্বরূপ গ্রহণ করেছিল, তার মধ্যেই নিহিত ছিল অর্থহীন আচারের প্রতি অনীহা। যার প্রকাশ ঘটেছিল পুরোহিতের কাছ থেকে যখন সাধন **'ছরাদের চাল'** ছিনিয়ে নেয়। যা খেতে নেই। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর রচনাশৈলীর মাধুর্যে এই আপাত অনাচারকেই পরিশেষে মানবীয় মর্যাদা দেন। আর ক্ষুন্নিবৃত্তিকে দেন ধর্মের ঐশ্বর্য। আবার ঐ ভাষার গার্হস্থ্য অন্তরঙ্গতাকে কঠিন, নির্মম বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করেন। গল্পের শেষে দেখা যায় মায়ের কথা মনে করতে করতে পুরুতের ওপর দুর্ব্যবহারের অনুতাপে সাধনের চোখ জলে ভেসে যায়—

"মা, তুমি যেমন তেমন করে স্বর্গে
যাও। সাধন এখন ভাত রেঁধে খাবে।
তুমি দোষ নিও না।"

আবার মহাশ্বেতা দেবীর **'দ্রৌপদী'** গল্পটি নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা একটি অগ্নিগর্ভ রচনা। ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে সাঁওতালদের নেতৃত্বে নকশাল আন্দোলনের অভ্যুত্থান **'দ্রৌপদী'**। আন্দোলনকারীদের ওপর প্রশাসনের পাশবিক অত্যাচার এবং অত্যাচারী শাসকগণের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা সাঁওতালদের জলন্ত দলিল হল আলোচ্য গল্পটি। **'দ্রৌপদী'** গল্পটির মাধ্যমে মহাশ্বেতা দেবী সমাজের সভ্য ও অসভ্য কাঠামোর মধ্যে থাকা বৈষম্য এবং এর বিরুদ্ধে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিরোধের প্রতীকী রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পে দেখা যায় **'দিকু'** অর্থাৎ বহিরাগতদের সাথে পুলিশের যোগসাজশে আদিবাসী সম্প্রদায়গণ প্রতিনিয়ত শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হয়। আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র দ্রৌপদী আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই দুর্দশা ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক শক্তিশালী প্রতীক হিসাবে আবির্ভূত হয়। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দোপ্দি অর্থাৎ দ্রৌপদী বাঁধা পড়েছে শক্তপোক্ত সূত্রে তার আদিবাসী সমাজের সঙ্গে। দ্রৌপদী তার সঙ্গীদের নিয়ে নানা আক্রমণ করে। সেখান থেকে বন্দুক লুঠ করে, এমনকি হত্যাকাণ্ডেও অংশ নেয়। আবার তার নির্ধারিত কাজে সাফল্য লাভ করার পর গান ধরে—

"হেন্দে রামব্রা কেচে কেচে
পুনড়ি রামব্রা কেচে কেচে।"

অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর শুরু হয় তার ওপর এক নারকীয় অত্যাচার। ক্ষতবিক্ষত হয় দ্রৌপদীর শরীর। সেনানায়কদের বিশ্বাস ছিল এইরূপ পাশবিক অত্যাচারের পর দ্রৌপদী নিশ্চয়ই সহকর্মীদের নাম বলে দেবে। কিন্তু তার পরিবর্তে ক্রোধে, ক্ষোভে দ্রৌপদীর এক রণংদেহি রূপ আমরা শেষে দেখতে পাই। যা সেনানায়কদের মনে ভীতির সঞ্চার ঘটিয়েছিল।

'শিকার' গল্পে মহাশ্বেতা দেবী অন্তেবাসী মেরী ওঁরাও সাহেবের জারজ হিসাবে জাত-পাত সংস্কারের বিচারে একটি অদ্ভুত বৈষম্য দূরত্বে প্রতিষ্ঠিত। গল্পে আদিবাসী নারীরা কীভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এবং রাষ্ট্রের দ্বারা শোষিত হয়, তা তুলে ধরা হয়েছে। এই গল্পটি আদিবাসী ওঁরাওদের নিয়ে লেখা। আলোচ্য গল্পটিতে মেরীর জীবনের ওঠা-পড়ার মাধ্যমে মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়েছেন কিভাবে আদিবাসী নারীরা ও আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব উপায়ে প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে।

উপসংহার

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর লেখনীতে বিশেষত ছোটগল্পগুলিতে যে কথনবৃত্ত বেছে নিয়েছেন তাতে যেমন বাস্তবের উপস্থিতি আছে, তেমনই আছে বাস্তবকে ইতিহাসের ক্রমান্বতায় পরিবর্তনশীল রূপে দেখানোর নানা পদ্ধতি। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সমাজের সম্ভাব্য কাহিনীকে এক পুরাবৃত্তীয় কল্পমাত্রা দেন, যা বাস্তবের মধ্য দিয়ে উদ্ভব হয়ে বাস্তবকে অতিক্রম করে। দোপ্দি মেঝেন অর্থাৎ দ্রৌপদী,

All rights reserved. © 2025

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 2 October, 2025 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

চণ্ডী বাঁয়েন, জটি ঠাকুরানি প্রভৃতি সকলেই বাস্তবের মানুষ হয়েও যেন বাস্তববিসারী। এইভাবে তাঁর লেখা হয়ে উঠেছে আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক দলিতস্বরূপ।

গ্রন্থপঞ্জী

সোনারতরী, প্রকাশক মণিমুকুট মিত্র। বিশ্বভারতী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা-১৭।

খাঁ, রণজয়, বৌদ্ধদর্শনে দুঃখ এবং দুঃখ নিরোধ মার্গ : একটি সমীক্ষা।

দাশ, শিশিরকুমার, বাংলা ছোটগল্প ১৮৭৩-১৯২৩ ॥ বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড॥ ১ শঙ্কর ঘোষ লেন কলিকাতা-৬

খান, রাজেশ ও মণ্ডল, ড. সুজয়কুমার। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে অন্ত্যজ ও আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিসর : নির্বাচিত গল্পকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ।

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন। লেখিকা কর্তৃক নির্বাচিত। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া।

দাস, বাসুদেব ‘মহাশ্বেতা দেবী : বাংলা কথাসাহিত্যে নবজীবনের রূপকার’, আজকাল পত্রিকা, কোলকাতা, ১৮ জুলাই ১৯৯৮, মুদ্রিত।

All rights reserved. © 2025